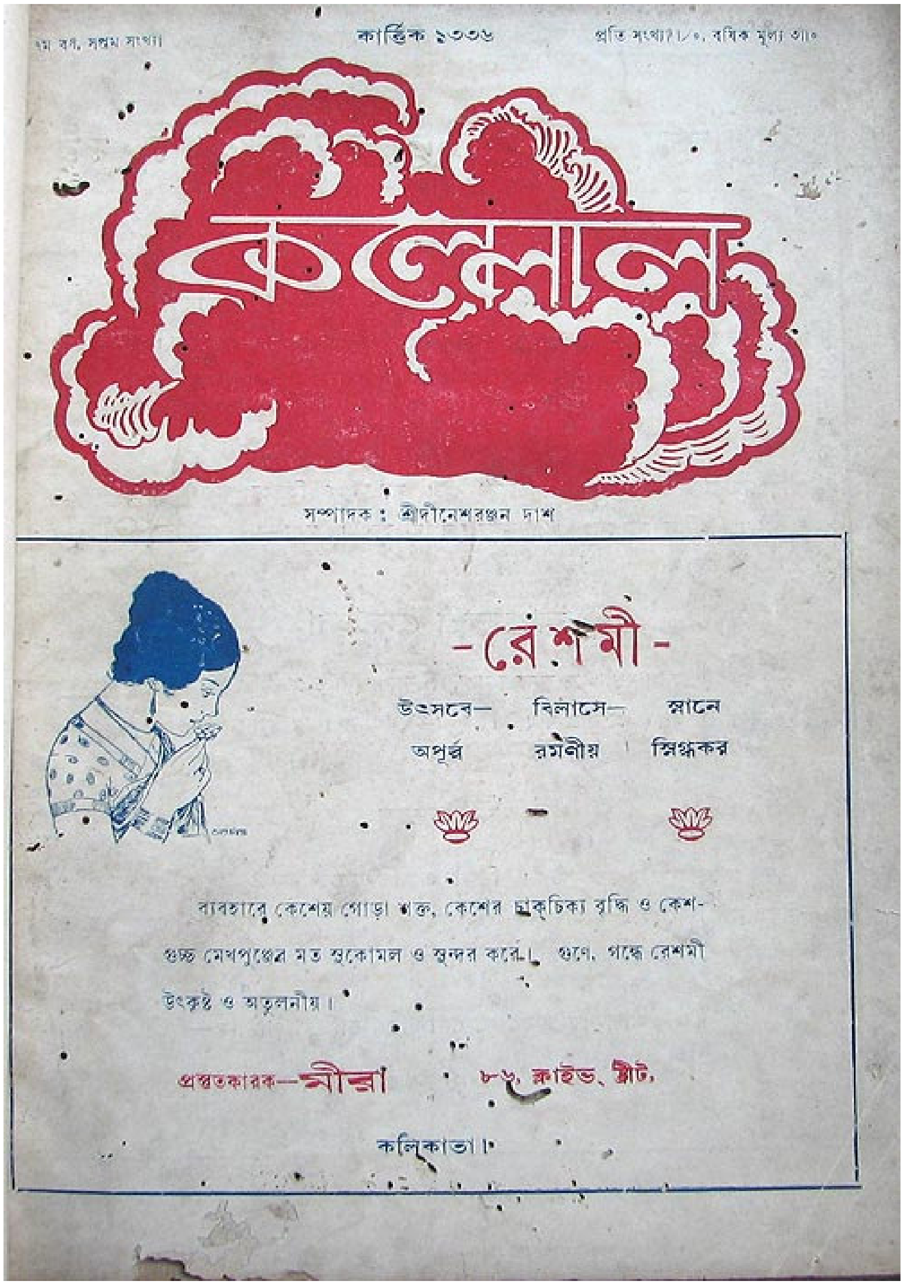

কল্লোল পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমকালীন তরুণ ও প্রতিবাদী লেখকদের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে এই পত্রিকা বের হয়। সম্পাদক ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নবীন লেখকদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বিষয় ও ভাষায় রবীন্দ্র উত্তরাধিকার থেকে সরে এসে এঁরা ভিন্ন পথের সন্ধান করেছিলেন।অন্ত্যজ শ্রেনীর জীবনযাত্রাকে এঁরা বাংলাসাহিত্যে ফোটাতে চাইলেন এবং তথাকথিত শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্নে পুরনো মূল্যবোধকে অস্বীকার করলেন, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ছিল এঁদের মূলমন্ত্র। সেই কারণে এঁদের অনেক শত্রু ছিল এবং প্রচলিত পত্রিকাগুলিতে এঁরা অনেকেই ছিলেন অপাংক্তেয়। অথচ অনেকেরই প্রতিভা ছিল এবং পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নিজ কাজের দ্বারা তাঁরা প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছেন। কল্লোলের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এইখানে যে সে :সমকালের প্রতিবাদী কণ্ঠগুলিকে রক্ষা করেছিল, লালন করেছিল এবং ভাবীকালের দরবারে পোঁছে দিয়েছিল।

কল্লোলের প্রধান লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ :চট্টোপাধ্যায় , বুদ্ধদেব বসু, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ পভৃতি। কিন্তু যাঁরা সেভাবে কল্লোলের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ দাশ, বা সেকালের অন্যান্য লেখকেরা তাঁদেরও উদার অভ্যর্থনা ছিল এখানে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র

সেদিন দুপুরবেলায় হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, —'গৃহদাহ'-এর দাহ-কার্য্যটি কিরূপে সমাধা হইয়াছিল তাহার ইতিহাসটি আবার একটু ঝালাইয়া লইতেছিলাম। তখন অচলা, সুরেশ ও মহিম জব্বলপুরের উদ্দেশ্যে হাওড়া রওয়ানা হইয়াছে। কিন্তু যিনি এই তিনটি হতভাগ্য নর-নারীকে ঝড়-জলের মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই সে দিনকার সেই কাঠ-ফাটা রৌদ্রের মধ্যে আমাকেও যে হাওড়া অভিমুখেই যাইতে হইবে এ-কথা অচলাদের বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কি ভাবিতে পারিয়াছিলাম!

উত্তর-ভারতীয় প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য সম্মিলন এবার কানপুরে হইবে। কানপুর হইতে জরুরী চিঠি আসিল—সম্মিলনীর সভাপতি হইবার আমন্ত্রণ-পত্র পনের দিন আগে শরৎবাবুকে পাঠাইয়াছি; তাহার কোনো উত্তর না পাইয়া আমরা সকলেই বড় উদ্বিগ্ন ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমাদের হইয়া যেমন করিয়া পার হাতে পায় ধরিয়া তাঁহাকে রাজি করাইয়া অবিলম্বে টেলিগ্রাম—ইত্যাদি।

শিবপুর যাইয়া শুনিলাম, শরৎবাবু আজকাল সেখানে থাকেন না, রূপনারায়ণের ধারে তাঁর নূতন বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। অনুমানে বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথকে যে কারণ কলিকাতা ছাড়া করিয়া শান্তিনিকেতনে তাড়া করিয়া লইয়া যায়, সেই কারণ এখানেও কাজ করিতেছে। কিন্তু 'পাব্লিক' নামক মক্ষিকাটি যখন আক্রমণ করিতে সংকল্প করে তখন চোদ্দ হাত জলের নীচে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সে সক্ষম হয়—বোলপুরের অবারিত মাঠের শূন্যতা এবং রূপনারায়ণের পঙ্কিল জলের গভীরতা, কিছুতেই তার পথ আটকাতে পারে না।

শরৎবাবুর বাড়ী যাইয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা সাড়ে দশটা সুইচ টিপিলেই যেমন আলো জ্বলিয়া ওঠে, তেমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আতিথেয়তার সুইচ যে কোথায় দিয়া কে কেমন করিয়া টানিয়াছিল টেরই পাইলাম না—দেখিতে দেখিতে হাত পা' ধুইবার জল ও জল-খাবার অপরিচিত অতিথির জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎবাবু তখন অন্য বাড়িতে ছিলেন কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিলেন।

কলিকাতার কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া

রূপনারায়ণের তীরবর্ত্তী এই নির্জ্জন পল্লী-প্রান্তে বাধাবিঘ্নহীন সাহিত্য-সাধনার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেখানে আসিয়া চড়াও করিতে সঙ্কোচ হইতেছিল। কিন্তু আসরে নামিয়া ঘোমটা দিয়া কোন লাভ নাই জানিয়া যখন কারণ নিবেদন করিলাম, তখন শরৎবাবু কহিলেন, পরশু ত আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলুম, অস্বীকার করব, কিন্তু তারপর অনেক ভেবে রাজি হয়েচি।

আমি বলিলাম, "রাজি না হ'লে পায়ে ধরে হোক্ যেমন করে হোক্ রাজি করবার জন্যে কানপুর থেকে আমার কাছে অনুরোধ-পত্র এসেছে। শরৎবাবু কহিলেন, রাজি হয়েছি কেন জান? আমি জানি, সেখানকার বাঙালী 'ইয়ংম্যান'রা আমাকে চায়। তাদের আগ্রহকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নে—তাদের আমি বড় ভালবাসি! বুড়োরা আমাকে দেখ্‌তে পারে না, আমাকে গালাগালি দেয় তা' আমি জানি, কিন্তু তবু আমাকে যেতে হবে।

আমি ভয়ে-ভয়ে কহিলাম, হাঁ, তার আভাস ইঙ্গিত কংগ্রেসের সময়েই কানপুরে পেয়ে এসেছি।

ক্ষণকালপরে তিনি হাসিয়া কহিলেন, এ সব কাজে আমার একটা বিপদ হয় কি জান? এ কথাটা আমি আজকাল প্রায় জায়গায়ই বলি—ঢাকায়ও সে দিন বলেচি। মধ্যে মধ্যে তামাক না টেনে ছয়-সাত ঘণ্টা সুবোধ শান্তশিষ্ট বালকের মত বসে থাকা—ওইটে আমার পক্ষে একেবারে অসাধ্য! কাজেই মধ্যে মধ্যে সভা ত্যাগ করে উঠে যাবার অনুমতি আগে থাক্‌তেই আমাকে নিয়ে নিতে হয়।

আর একটি ভদ্রলোক পাশে ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, কালরাত্রে তিনটের সময়ে আপনার তামাকের টান শুনেছি!

শরৎবাবু কহিলেন, ওই অভ্যাস হয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যেও বালিশের কাছে নলটা না পেলে ভালো ঘুমই হয় না।

ক্ষণকাল পরে তাঁর নিজের লেখা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি কহিলেন, আমার লেখা ছেলেরা খুব পছন্দ করে তা' আমি জানি। বড়দের মধ্যেও অনেকে আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু যাঁরা গালাগালি দেন তাঁরা যে কেন দেন তা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। তার একটা কারণ আমার এই মনে হয় যে, তাঁরা অনেকেই না পড়ে আমার উপর অবিচার করেন। দুর্নীতির সমর্থন করি বলে আমার দুর্নাম আছে, কিন্তু কোন্‌টা দুর্নীতি আর কোন্‌টা সুনীতি সেইটেই এ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। সে-দিন একজনের সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল। আমি বল্লুম, এ সম্বন্ধে ক'খানা বই আপনি পড়েছেন? আমি জিনিষটা অনেক ঘেঁটেছি, অনেক ভালো ভালো বই পড়েচি। ডাক্তার যে কথা বলেন, যেটা সায়েন্সের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সত্য, তাকে দুর্নীতি বলে' উড়িয়ে দিলেই ত আর সে উড়ে যায় না। অবশ্য এ কথা আমি বলি নে যে, যা সত্য তাই সাহিত্য হতে পারে। কিন্তু যার শক্তিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই বা 'ইন্‌এভিটেবেল্' তাকে চাপা দিয়ে লাভ কি? কাব্য আর উপন্যাস কি এক কথা?

কিছুকাল নীরব থাকিবার পরে একজন প্রবীন সাহিত্যিককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এই —বাবু কি আমাকে কম নিন্দা করেচেন, আমাকে পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে সোজা গালাগালটা দিয়েচেন? সে-দিন —বাবু তাঁকে বল্লেন, 'আপনি যে শরৎবাবুর উপর এত চটা, তাঁর বই দু'একটা পড়েচেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'পড়ব আবার কি? ও কি পড়বার যোগ্য?' তারপর 'দেনাপাওনা' ও আরো দু' একখানা কি বই পড়ে এক ভদ্রলোককে দিয়ে আমাকে একদিন বলে' পাঠিয়েছেন, 'আমি আপনাকে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করি। উপন্যাসের মধ্যে যে এ রকম 'ডায়ালগ্' থাক্‌তে পারে আগে আমার ধারণা ছিল না। আমি এখন থেকে ডায়ালগ্ লেখা শিখ্‌চি; লিখে নিজেই পড়ি এবং নিজেই আবার 'কারেক্ট' করি।'

তারপর আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর প্রসঙ্গ তুলিলেন। তাঁর আন্তরিক বিদ্বেষ যে কেমন করিয়া আস্তে আস্তে আন্তরিক প্রশংসায় পরিণত হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কিন্তু এই দু'জনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কোন দিন হারাই নি। এঁদের ব্যক্তিগত জীবন অতি পবিত্র, খাঁটি নিষ্ঠাবান হিন্দুর জীবন সমভাবে চিরদিন যাপন করে এসেছেন। কিন্তু যাঁদের চরিত্র জঘন্য, অত্যন্ত

হীন, যাঁরা চিরদিন পঙ্কিল জীবন যাপন করে এসেচেন, তাঁরা যখন সুনীতির দণ্ড নিয়ে আমাকে তাড়া করে আসেন আমার সত্যই ভারী দুঃখ হয়। অবশ্য তাঁদের সম্বন্ধে এ রকম করে বলা আমার অন্যায়, কারণ এখন তাঁরা স্বর্গীয় হয়েচেন; কিন্তু সাহিত্যে আমি দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েচি এ-কথা যাঁরা বলেচেন তাঁরা আমার লেখা ভালো করে না পড়ে বলেচেন সন্দেহ নেই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, রবিবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয় না?

শরৎবাবু কহিলেন, আগে মাঝে মাঝে হত, এখন আর বিশেষ হয় না। তিনি থাকেন ওইদিকে, আমি থাকি এ-দিকে।

কহিলাম, গালাগালি তাঁকেও ত কম সহ্য করতে হয় নি!

সে আর বল্‌তে! সে বিষয়ে তাঁর তুলনায় আমি শিশু। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের হাতে তিনি যে লাঞ্ছনা, যে অবমাননা পেয়েছেন সে কথা স্মরণ হলে দুঃখে এবং লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'মার খেলে তার আঘাত কি লাগে না শরৎ? কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?'—দেখেছ, কি কাল্‌চার, কি শিক্ষা-দীক্ষা, কি অসাধারণ সহিষ্ণুতা! কোনো দিন মুখ খুলে এতটুকু প্রতিবাদ করেন নি। ঋষিতুল্য মহাপুরুষ তিনি, সৌম্য শান্তমুখে নীরবে সব সহ্য করেচেন। তাঁর মত ধৈর্য্য কি আমার আছে? আমি এই ত তোমার কাছেই আমার নিজের কত কথা বলে ফেল্লুম!

—এক একবার ইচ্ছে করে, এই রকম অযথা maliciously যারা তাঁকে নিন্দা করে, তাদের প্রতিবাদ করে খুব করে একবার চুটিয়ে লিখে দিই। উনি নেহাৎ ভালো মানুষ, ওঁর দ্বারা ত এ-কাজ হবে না। আমি মুখ্যু-সুখ্যু পাড়াগাঁয়ের লোক, সব কথা খোলাখুলি ভাবে সোজা কাঠ্‌-খোট্টা রকমে বোল্‌তে পারব।

দেশের লোকের হাতে রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনার কথা বলিতে বলিতে শরৎবাবু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। একটা নিগূঢ় মর্ম্ম-বেদনার ছায়া মুখের উপর ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা বাহির হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল। উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, অথচ যাঁরা তাঁকে অযথা নিন্দা করতেন তাঁদের জন্য সাহিত্য-সমাজে তাঁদের সুপরিচিত করবার জন্য তিনি কত না চেষ্টা করেছেন! —বাবু 'ঘরে-বাইরে'র সমালোচনা লিখ্‌তে গিয়ে এমন সব কথা লিখলেন, যা কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়! ললিত ব্যানার্জ্জী মহাশয় রবিবাবুর উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন না। তিনি পর্য্যন্ত সুরেশ সমাজপতিকে বলেন যে, এ-লেখা যদি আপনি 'সাহিত্য'-এ ছাপান তবে 'সাহিত্য'-এর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। তবু সুরেশ বাবু সেটা প্রকাশ করলেন!

* * * *

আশ্চর্য্য! কেউ একটা 'ক্যারেক্‌টার' সৃষ্টি করতে পারবে না?

আবার কহিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্য আমাদের যে, এত বড় কবিকে আমরা চিন্‌তে পারলুম না। পশ্চিমের লোকেরা অনুবাদের মধ্য দিয়ে কি ছাই পেয়েচে, তাঁর প্রতিভার দশ ভাগের এক ভাগেরও পরিচয় তারা পায় নি। তবু তারা যেটুকু ওঁকে বুঝেচে আমরা তাও বুঝি নি। এত বড় কবি আমাদের দেশে আর হয় নি।

* * * *

মানুষের হৃদয়ের যতরকম অনুভূতি থাকতে পারে তার কি আশ্চর্য্য প্রকাশ হয়েছে তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে! সৌন্দর্য্যের কি একটা অবিরাম বিচিত্র জীবনব্যাপী প্রবাহ!

—এই ত ৬৫ বছর বয়স হ'ল, আমাদের কপালে আর কত দিনই বা টিঁকে থাকবেন? তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—আমাদের এই পরাধীন দেশে সাহিত্য ছাড়া গর্ব্ব করবার আর কি আছে? আর কিছু চাই নে ওঁর কাছে, আরো কয়েকটা বছর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন। যে-দিন তিনি থাক্‌বেন না, সে-দিন যে আমাদের কত বড় দুর্দ্দিন তা' ভাবতেও ভয় হয়। কতদিন যাবৎ এই মরণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন। শেষ বয়সের কবিতাগুলিতে মৃত্যুকে যে কত রকম মূর্ত্তিতে দেখতে চেষ্টা করেছেন তার ঠিক

নেই। এই কালও একটা কবিতা পড়ছিলুম, তা'তেও সেই একই কথা!

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবের কথা উঠিল। কহিলাম, আমাদের তথাকথিত সমালোচকেরা ত এ পর্য্যন্ত বলতে ছাড়েন নি, রবীন্দ্রনাথ ইব্‌সেন-ম্যাটারলিঙ্কের অনুকরণ করেছেন।

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া শরৎবাবু কহিলেন, অনুকরণ? —ইব্‌সেন-ম্যাটারলিঙ্ক আমাদের 'গীতাঞ্জলি' আমাদের 'বলাকা' আমাদের 'খেয়া' 'নৈবেদ্য'র মত সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছেন—তিনি যাবেন তাঁদের অনুকরণ করতে! তাঁদের একটা ভাব বা আইডিয়ার সঙ্গে ওঁর একটা ভাব বা আইডিয়ার মিল দেখ্‌লেই তাকে চুরি বলতে হবে? দু'জনের মনে কি একই রকম ভাব, একই রকম চিন্তা আস্‌তে পারে না?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, দেখতে পাচ্চ না, সাহিত্যের ধারাটা কেমন বদলে দিয়েছেন। আমায় একদিন বল্‌ছিলেন, 'কি বল শরৎ তুমি, আমি জানি আমার কবিতার দু'শ পাঠকও নেই।' আমি বল্লুম, 'কি যে বলেন, আজকাল এমন একটা কবিতা আপনি দেখতে পান যার মধ্যে আপনার প্রভাব নেই? আমি অনুকরণ বল্‌ব না, কিন্তু কাব্যের যে ধারা বইয়ে দিয়েছেন সেই ধারা অনুসরণ করে পরবর্ত্তী সমস্ত কবিরা চলেছেন।'—আর শুধু কবিতার কথাই বলি কেন? উপন্যাসের ক্ষেত্রে, ভাষায়ও কি তিনি সেই কাজ করেন নি? আজ কাল কি কেউ বঙ্কিম বাবুর ভাষায় লেখে বা সেই রকম উপন্যাস রচনা করে?

—হাওড়া কি অন্য কোথায় ঠিক মনে নেই, একটা ছোট মতন সাহিত্য সম্মিলনে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যা লেখেন তা বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, আর বেশ ভালোও লাগে; কিন্তু রবিবাবুর লেখা মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না,—কি যে তিনি লেখেন তা' তিনিই জানেন।'—ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন তাঁর এই কথা শুনে নিজেকে অহঙ্কৃত মনে করে আমি খুব খুসি হব। আমি উত্তর দিলুম, 'রবিবাবুর লেখা তোমাদের ত বুঝবার কথা নয়। তিনি ত তোমাদের জন্যে লেখেন না। আমার মত যারা গ্রন্থকার তাদের জন্যে রবিবাবু লেখেন, তোমার মত যারা পাঠক তাদের জন্যে আমি লিখি।'

কিছুকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, তাঁর কথা বলো না—তিনি আমার গুরু, আমার গুরু।

গল্প লেখার সময় সমস্ত প্লটটা মনে মনে আগে ঠিক করিয়া লন কিনা জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, সমস্ত আগা গোড়া মনের মধ্যে আমার ঠিক হয়ে যায়, এমন কি ভাষাটা পর্য্যন্ত আগে থেকেই অনেকটা জান্‌তে পারি।

এত সব খুঁটিনাটি 'ডিটেলস্' কি করে এত মনে রাখতে পারেন?

হাঁ, ওদিকে 'মেমরি' খুব 'শার্প'। তবে যে সব খুঁটি নাটির গল্পের উপর কোনো 'ডাইরেক্ট' প্রভাব নেই, বা দু' একটা সামান্য উপমা—এ সব ত আর আগে থেকে মনে হয় না, ও লিখতে লিখতে এসে পড়ে। রবিবাবু ও-রকম করেন না। তাঁর অন্য রকম 'টেম্পারামেণ্ট' বলেই হোক কি যার জন্যই হোক, আগে থাকতে সমস্তটা ভেবে চিন্তে গুছিয়ে নিয়ে লিখতে পারেন না। আরম্ভ করেন, কোথায় গিয়ে যে পৌঁছুবে তা অনেক সময় নিজেই জানেন না।

—আমাকে একদিন রবিবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শরৎ, শুনতে পাই তুমি নাকি গল্পের শেষ থেকে আরম্ভ করে উল্টোদিকে গোড়ায় এসে পৌঁছও!' আমি বল্লুম, 'তা নয়, তবে মাঝখানে পাঁচ-ছ'টা পরিচ্ছেদ ছেড়ে দিয়ে পরের দিকের একটা পরিচ্ছেদ অনেক সময় লিখি। —একটা চরিত্রের 'ডেভেলপ্‌মেণ্টে'র জন্য আমি খুব সতর্ক থাকি। কোনো ঘটনা চরিত্রের উপর মুখ্যভাবে, কোনো ঘটনা গৌণভাবে কাজ করে, কোনোটা একটু influence করে, কোনোটা বা সামনের দিকে একটুমাত্র ঠেলা দেয় মাত্র,—এই রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষণে যে সব সৃষ্ট চরিত্র উপরের দিকে উঠ্‌তে বা নীচের দিকে নামতে থাকে তাকেই আমি চরিত্রের ডেভলপ্‌মেণ্ট বলি।

অন্য কোনো বই এখন হাতে আছে কি না জানিতে চাওয়ায় বলিলেন, না আর কিছু নেই, 'পথের দাবী'টা শেষ করেচি; শীগ্‌গীরই বেরুবে। ওটা পড়েচ?

আমি বলিলাম কবে বই হয়ে বেরুবে সেই অপেক্ষায় আছি। ও রকম একটু একটু করে কৃপণের মত পড়তে পারি নে।

শরৎবাবু কহিলেন, না ওটা ত সে রকম নয়। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। প্লটের উপর ত আমি জোর দিই নি—কাজেই খণ্ড খণ্ড ভাবে পড়তে আটকায় না।

ভবিষ্যতে আরো বই লিখিবার ইচ্ছা আছে কিনা জানিতে চাহিলাম। উত্তরে কহিলেন, আরো দু'তিন-খানা লেখবার ইচ্ছে আছে। তারপর ভাবছি নাটক লিখব। নাটকের ধারাটার একটা পরিবর্ত্তন করবার জন্যে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। প্ল্যানটাও মনে মনে অনেকটা ভেবে রেখেছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার প্রথম লেখা কোন্‌টা?

কহিলেন, 'বড়দিদি', 'দেবদাস'—ওইগুলো। আমি দেখেছি আমার লেখায় কয়েকটা স্তর আছে। প্রথম স্তরে 'দেবদাস' 'বড় দিদি' ইত্যাদি পড়ে। দ্বিতীয় স্তরে 'পরিণীতা', 'রামের সুমতি', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি পড়তে পারে। তৃতীয় স্তরে 'গৃহদাহ' 'দত্তা' ইত্যাদিকে ফেলা যেতে পারে। চতুর্থ স্তরের আরম্ভ 'পথের দাবী'তে সুরু হয়েচে।

ইতিমধ্যে গাড়ীর সময় ঘনাইয়া আসিল। আমি বিদায় লইতে চাহিলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সে কি, না খেয়ে যাবে কি? গেরস্তের বাড়ীতে দুপুর বেলা অতিথি অভুক্ত গেলে কি গেরস্তের মঙ্গল হয়? তোমার বাড়ীতে অতিথি গেলে না খাইয়ে তাকে বিদায় দিতে পার?

আহারান্তে লাইব্রেরীর ঘরটা ঘুরিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, খালি গায়ে মাটিতে বসিয়া কুকুরের গায়ের পোকা বাছিয়া দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, কিহে, আমার গলায় তুলসীর মালা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছ? যে লোকটা এমন দুর্নীতিপরায়ণ লেখার সৃষ্টি করে, সে তুলসী-মালা পরবে এ-কথা ভাবতে পার?

রৌদ্র-তপ্ত মাঠের মধ্য দিয়া যখন রেল-ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিলাম তখন মনে হইতেছিল যে, পৃথিবীতে এই আন্তরিক অকৃত্রিম আতিথেয়তা কত সুদুর্লভ, অথচ মানুষের পক্ষে ইহার প্রয়োজন কত সুগভীর।

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

সুকুমার

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

একান্তই সুকুমার শিশু ধরণীর,
আওতায় বেড়ে-ওঠা অঙ্কুরের মত;
মুখে চেয়ে মনে হত আলো আর নীর,
পায় নাই প্রাণ তার চেয়েছিল যত।
তাই এলো না ক' তার সরস যৌবন,
বসন্তের সমারোহে সাজাতে উৎসব,

শাখায় পল্লবে পুষ্পে সতেজ শোভন,
সুয়ে প'ড়ে গেল ভুঁয়ে না যেতে শৈশব।
বনভূমে তারি লাগি জাগিছে বেদনা,
যে অঙ্কুর করিল না কোন অঙ্কপাত,
আশার ভঙ্গুর স্বপ্ন জীবন-সাধনা
এল রাত্রি, অনাগত রহিল প্রভাত। *

* কবি এই কবিতাটি ৺ সুকুমার ভাদুড়ীকে মনে করিয়া লিখিয়াছেন:—সম্পাদক

কল্লোল

উদ্বোধন

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।